

“ভুল কথা একটাও বলোনি।” শৈবাল ওর স্বকমকে দাঁতে হেসে সুপর্ণাকে কোনো অবকাশ না দিয়েই ঋটিতি প্রায় বুকের সংলগ্ন করলো, “কেবল ভুলে গেছ, দরজার বাইরে একজন বেয়ারা আছে। আর দরজার বাইরে, লাল বাতিটার সুইচ আমি আগেই অন করে দিয়েছি। যাকে বলে রক্ত-চক্ষুর নিবেদ-সংকেত।”

সুপর্ণা দেখল, ওর বুকে ঠেকেছে শৈবালের কপাল। পোশাকে-আশাকে আর বাকচাতুর্যে যতো আধুনিকই হোক, বুকের স্পর্শে একটা শিহরিত লজ্জাকে চাপা দায়। বদ্ধ ঘরে তৃতীয় ব্যক্তি না থাকলেও কোনরকমে শৈবালের হাত থেকে, একটা হাত ছাড়িয়ে, ওর মাথাটা সরিয়ে দিল। ঢেউ খেলানো চুলের মুঠি আলগা করে ধরলো। মুখে ততক্ষণে লেগে গিয়েছে রক্তচ্ছটা, “মতলবটা কি তোমার বল দিকিনি? আমি তো তোমাকে ওরকম প্রভোক করতে চাইনি। তবে কেন....”

“আমার ইংরেজি বাঙলা, ছই-ই খুব খারাপ।” শৈবাল চেয়ার থেকে মুখ তুলে সুপর্ণার লজ্জা আর অস্বস্তিভরা মুখের দিকে তাকিয়ে হাসলো। “আসলে, তুমি তো সমস্ত দিক দিয়ে আমার চোখে মূর্তিমতী প্রোভোকেটর। কিন্তু ঘরে ঢুকে হুক্‌খার পরেই তুমি আমাকে বলেছিলে, আমার মধ্যে তুমি অরিন্দমের পাগলা দাপানিটা দেখতে পাও না। ...আহা, না না, আমি অবিশিষ্ট ও কথাটার জবাব দিতে বা শোধ নিতেই, এসব কিছু করছিনে। তুমি ভালোই জানো, অরিন্দমের পাগলা দাপানি আমার সত্যি নেই, কারণ আমার স্থান কাল পাত্রী নিয়ে হারানোর ভয় আর ছটকটানি নেই। অকিসের কামরায়, এমন অসময়ে, তোমার সত্তা লাগিয়ে আসা ঠোঁটের রঙ চুবে সেবো, এতোটা কাণ্ডজ্ঞানহীনও আমি নই। তবু যে কেন তোমাকে কাছে টেনে নিলুম—মানে—”

শৈবাল কথাটার শেষ খুঁজে পেলো না। মুখের হাসিতে একটা অসহায় অভিযুক্তি। ওর হাত থেকে মুক্ত হয়ে, সুপর্ণা হুঁহাত সরে

দাঁড়ালো। ঘাড় ঝটকা দিয়ে কপালের চুলের গুচ্ছ সরাসরে গিয়ে, নতুন করে আর এক গুচ্ছ চুল কপালে এসে পড়লো। বয়েজ কাট থেকে কয়েক ইঞ্চি বড় চুল, ঘাড়ের কাছে বন্ধনহীন অব্যাহত হয়ে যেন ফুঁসছে। ঘাড় ওর সোজা হল না। নুন্ন কাজলটানা আয়ত কালো চোখে জ্রুকুটি দৃষ্টি। সবুজবনে লাল ফুল ছাপানো রেশমী শাড়ির আঁচল টানল বুকে। কিন্তু যতটা টানলো, ততটা খসলো। টানা চোখ, টিকলো নাক, ঈষৎপুষ্ট ঠোঁট, প্রায় করসা রঙ, সব মিলিয়ে ওকে রূপসী বলা যাবে কি না সন্দেহ। তবে দৃষ্টি আকর্ষণ করার সমস্ত-রকম রমণীয় সৌন্দর্যই ওর আছে। স্বাস্থ্য আছে দীপ্তি। বাড়তি মেদ বলে কিছুই নেই, অথচ প্রায় দীর্ঘ শরীরের গঠন নিখুঁত। কাঁখে ঝুলছে কাজের মেয়েদের মতোই বড় ব্যাগ। বাঁ হাতে ঘড়ি। কানে ছোটো ছোটো মুক্তা। বয়েসটা বাড়িয়ে বলতে ভালবাসে। কারণ জানে, ওর বয়েসটা নিয়ে কেউ মাথা ঘামাতে হলে ওকে নিয়েই ঘামাতে হয়। চক্কিশটাকে আটাশ বললেও, আটাশে টসটসই করে। কিন্তু এখন ওর ঘাড় বাঁকানো জ্রুকুটি চোখে যেন খুবই বিরক্তি, উদ্বেজনা আর অভিযোগ “মানেটা বলো, তবু কেন ওরকম কাছে টেনে নিলে?”

“যে-কথাটার জবাব কোনদিন দিতে পারিনি, সেই কথাটাই তুমি জিজ্ঞেস কর।” শৈবাল ওর ঘুরন্ত চেয়ারে একটু বাঁ দিকে টাল খেলো। “ভোমার সঙ্গে যা সব করি, তাকে অসম্ভ্যতা বলে কিনা জানিনে। তবে এখন তুমি আমাকে অসম্ভ্য বলোনি। যে-শব্দটা সত্যি প্রোভোকেটিং। আসলে কী জানো রিন্টি (সুপর্ণার ডাক নাম) এক এক সময় কেমন হেলপলেস হয়ে যাই। অসহায়কে করুণা কর। দয়া করে বস। অরিন্দম আর কৃষ্ণার মজার কিস্তাটা শোনা যাক।”

বজ্রিণ বছরের শৈবাল। অধিকাংশ বাঙালীর মতোই শ্রাহল্য রঙ। বড় চোখ ছোটো চুলুচুলু। বুকের দীপ্তিটাকে শানিয়ে রাখার

দরকার করে না। নিজেকে কোনো দিক থেকেই অসাধারণ দেখানো বা জানানো লজ্জার বিষয় বলে মনে করে। ভালো কোম্পানির একজন উপযুক্ত একজিকিউটিভ হিসাবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছে সহজেই। প্রাইভেট লিমিটেডের কর্তৃপক্ষ ডিরেকটদের আস্থা-ভাজন। সহকর্মীদের সঙ্গে সম্পর্ক ভালো। অধস্তন কর্মচারীদের সঙ্গে আছে একটা অনায়াস মেলামেশা। অথচ এর সমস্ত কিছু মধ্যোই কোথায় যে একটা দূরত্ব আছে, তা সহজে টের পাওয়া যায় না। কিন্তু অপরকে সেটা অনুভব করতেই হয়। তবে অহংকারি কেউ বলে না ও কে। মাঝারি লম্বা। সাদা ফুল স্লিভ শার্ট আর ট্রাউজার ওর প্রিয়। অপ্রিয় হল, রাষ্ট্রীয় ভাষায় যাকে বলে কণ্ঠ-লেগুটি। রোমান্টিক চেহারার বাঙালী যুবক বলতে যা বোঝায়, একরকম তাই বলা যায়। কিন্তু এখন ও সুপর্ণার সঙ্গে যা-ই করে থাকুক, আসলে বত্রিশ বছর বয়সের তুলনায় ওকে শান্ত আর চিন্তাশীল বলে মনে হয়।

সুপর্ণা বোধহয় ভেবেছিল, আরও কিছু বলবে। কিন্তু শৈবালের কৈফিয়ত দেবার ভঙ্গিতে কথাগুলো শুনে ওর ভ্রুকুটি চোখে হাসির ঝিলিক হানলো। এবং ঠোট ফুলিয়ে মুখের অদ্ভুত ভঙ্গি করলো, “অসভ্য!”

“উঠে দাঁড়াতে হচ্ছে করছে।” শৈবাল যেন দাঁড়াবারই উদ্যোগ করলো।

সুপর্ণা বসে পড়লো মুখোমুখি চেয়ারে, “কারণ আবার অসহায় হয়ে উঠছো, না? কিন্তু ঐ যে কী সব সেলফ্ ক্রিটিসিজম শুরু করেছিলে, আমরা এ যুগের ছেলেমেয়েরা...?”

“সেটা আর বলতে দিলে কোথায়?” শৈবাল টেবিল থেকে সিগারেটের প্যাকেট তুলে দেখালে। হুঁচোখে জিজ্ঞাসা অর্থাৎ সুপর্ণার অনুমতি প্রার্থনা।

সুপর্ণা ঠোটের ভঙ্গি করে, আবার ভ্রুকুটি চোখে তাকালো, “যেন বারণ করলেই শুনবে।”

“অথচ শুনলে কত ভাল হয়।” শৈবাল প্যাকেট থেকে সিগারেট বের করে ঠোঁটে চেপে ধরলো। টেবিল থেকে গ্যাস লাইটারটা ছেলে নিল। আলিয়ে সিগারেট ধরাল, “ঘরে ঢুকে হাসতে হাসতে তুমি অরিন্দম আর কৃষ্ণার ঘটনা বলতে আরম্ভ করেছিলে। আমি তোমাকে বসতে বলেছিলুম। তখন তোমার সেই অ্যালিগেশনটা শোনা গেল, অরিন্দমের পাগলা দাপানিটা তুমি আমার মধ্যে দেখতে পাও না। জানতুম, কথাটা, তুমি মন থেকে বলোনি। তাই হেসে আবার বলেছিলুম, বস, তারপরে বল। কিন্তু তুমি বসোনি। আমাকে মিথ্যেই একটু খোঁচা দিয়ে, তুমি অরিন্দম আর কৃষ্ণার সমালোচনা শুরু করে দিলে। বললে ওরা নির্ভজ্জ, লোভী, নীতিজ্ঞানহীন, স্বার্থপর ইত্যাদি ইত্যাদি। একমাত্র তখনই আমি এদের সমর্থনে ঐ কথাটা বলেছিলুম, আমি অস্বীকার করছি, আমরা এযুগের ছেলেমেয়েরা...”

শৈবাল এক মুখ ধোঁয়া ছেড়ে হাসলো। সুপর্ণা কাঁধের ব্যাগটা নামিয়ে, পাশের চেয়ারে রাখলো। ঘাড় বাঁকিয়ে গালে হাত দিয়ে তাকালো। ওর ঠোঁটের হাসিতে বক্রতা, “কথাটা শেষ কর।”

“স্বার্থপর মানে আমরা এ যুগের ছেলেমেয়েরা।” শৈবাল হাসলো, “স্বীকারোক্তিটা তুমি আমার মুখে আগেও শুনেছো। তাই কথাটা শোনবার আগেই তোমার ঠোঁট বেঁকে উঠেছে। অরিন্দম আর কৃষ্ণাকে দিয়ে কথাটা হয় তো আরো ভাল করেই প্রমাণ করা যায়। আসলে আমার বক্তব্য ছিল, অস্বীকার করবো না, আমরা স্বার্থপর। কিন্তু যারা এই অভিযোগটা করেন, তাঁরা যদি একটু ভেবে দেখতেন, কেন আমরা স্বার্থপর হয়েছি, তা হলে বুঝতে পারতেন, এ ভূমি আর বৃক্ষ সবই তাঁদের হাতে তৈরি। সেজন্য জেনারেশন গ্যাপ্ কথাটায় তাঁদের খুব সুবিধে করে দেয়। কিন্তু কী দেখছি আমরা? স্বার্থপর বলে কি, বোকা কিংবা উল্লুক হয়ে গেছি? অথবা অন্ধ? কিছুই বুঝিনে? আমাদের এই যুগটার ছেলেমেয়েদের